

# আফগানিস্তান ভ্রমণ

শ্রী রামনাথ বিশ্বাস

**Published by**

[porua.org](http://porua.org)

# সূচীপত্র

কাবুলের পথে

বোখারার বিশেষ ঘটনা

কাবুলের পথে

কাবুল

লক্ষ্মীর কথা

কাবুলে শীতের সকাল

আমানউল্লা

কাবুল হতে বিদায়

গজনী

কান্দাহার

হিরাড

## কাবুলের পথে

আমাদের দেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত আফগানিস্তান। আফগানিস্তানের বাসিন্দাকে আমরা কাবুলি বলি এবং কাবুলিদের আমাদের দেশে মহাজনী কারবার করতেই দেখতে পাই। এরা আমাদের দেশে আসা-যাওয়া করে। আমরা কিন্তু ওদের দেশে অতি অল্পই গিয়ে থাকি। আমার ধারণা ছিল, ভারতের যে সকল লোক মুসলমান ধর্ম মেনে চলেন তাঁরা তাঁদের স্বধর্মাবলম্বীদের অধ্যুষিত দেশগুলিতে আসা-যাওয়া করেন; কিন্তু আফগানিস্তান, ইরান, আরব, সিরিয়া, লাবানন এবং তুর্কি ভ্রমণ করে দেখলাম, আমার এ ধারণা ঠিক নয়। আমাদের দেশের লোক ওদের দেশে কমই যায়। না যাবার কারণ হ'ল, পাসপোর্ট যোগাড় করতে খুব বেগ পেতে হয়। দ্বিতীয় কারণ হ'ল, আফগানিস্তান সম্বন্ধে অনেকগুলি ভীতিপ্রদ গল্প আমরা ছোটবেলা হতে শুনে এসেছি। আমরা সেই গল্পগুলিকে সত্য বলেই মনে করি, সেজন্যও অনেকে আফগানিস্তানে যেতে চান না। লাহোর, রাওলপিণ্ডি এবং পেশোয়ারে সেরূপ গল্প আমাকেও শুনানো হয়েছিল, কিন্তু আমি তাতে কান দিইনি। তারপর যখন আফগানিস্তানে গেলাম, তখন দেখলাম কাবুলিরাও আমাদের মতই মানুষ, এবং তাদের দেশটাও আমাদের দেশের মতই 'মাটির'।

চীন, জাপান, কোরিয়া, থাইলেণ্ড, ইন্দোচীন এবং মালয় দেশ ভ্রমণ করে যখন কলিকাতায় এলাম, তখন সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের জানিয়েছিলাম যে আফগানিস্তান হয়ে ইউরোপ যাবার ইচ্ছা আমার আছে। ভাবিনি এতে আমার কোন ক্ষতি হবে। কথাটা প্রচার হওয়া মাত্রই জনকতক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি আমার পাসপোর্ট দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিনা দ্বিধায় তাদের কৌতূহল চরিতার্থ করেছিলাম। পাসপোর্ট নিয়েছিলাম সিংগাপুর থেকে। ভুলবশত তাতে আফগানিস্তান শব্দটি লেখাইনি। যারা হিতৈষী সেজে আমার পাসপোর্ট দেখেছিলেন, তারা পাসপোর্টের এই ত্রুটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণই নীরব ছিলেন। এমন কি দিল্লীর আফগান-কনসালও এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ না করে আফগানিস্তান যাবার 'ভিসা' দিয়েছিলেন।

কলিকাতা হতে পেশোয়ারের পথে কোন দুঘটনা ঘটেনি, শুধু গুজরাত শহরে একদিন সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান হ'লে বুঝেছিলাম শরীরের দুর্বলতাই এই পতনের একমাত্র কারণ। রোড-পুলিশ দয়া করে আমাকে উঠিয়ে পাশেই আর্যসমাজীদের পরিচালিত একটি মেয়েদের স্কুলে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, মাতৃজাতির একজনও এই হতভাগ্যের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য অগ্রসর হন নি। এমন দুঘটনা যদি ইউরোপের কোথাও ঘটত, তবে মায়ের জাতই সর্বপ্রথম আমার সাহায্যার্থ এগিয়ে আসতেন।

গুজরাতেৰ ঘোল খেয়ে কয়েকদিনেৰ মধ্যেই চাংগা হয়ে উঠলাম। এবাৰ পেশোয়ারেৰ দিকে রওনা হলোম এবং নিৰ্বিয়েই পেশোয়ার শহৰে পা দেবার পরই কতকগুলি অতিৰিক্ত-কৌতূহলী লোক আমাকে ঘিৰে দাঁড়িয়ে নানারূপ প্রশ্ন করতে থাকে। ওদেৰ হাত হতে নিজকে বাঁচিয়ে নিকটস্থ একটা ধৰ্মশালায় উঠলাম। ধৰ্মশালাৰ একটি কুঠিৰ দখল কৰে একখানা চাৰপাই-এৰ উপৰ শ্ৰান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে ভাবছিলোম “এ আবার কি?”

বিকেলে ধৰ্মশালা হতে বেরুতে যাব এমন সময় দাশগুপ্ত নামে এক যুবকেৰ সংগে দেখা হ’ল। পায়ে হেঁটে সে ভারত-ভ্ৰমণ কৰছিল। আলাপপৰিচয় হবার পর আমাকে নিয়ে সে স্থানীয় কালীবাড়ীৰ দিকে রওনা হ’ল। কালীবাড়ী ধৰ্মস্থান বলে শুধু ধাৰ্মিকেরাই যে সেখানে যাওয়া-আসা কৰে থাকেন, ধূৰ্ত পুলিচ কখনই তা মনে কৰে না। চোৰ ডাকাত ভিন্নও বিদেশী সরকারেৰ চক্ষে আৰ এক শ্ৰেণীৰ লোক যারা দেশভক্ত বলে বিশেষভাবে পৰিচিত, তারাও যে কালীমাতাৰ শৰণাগত হন পুলিচ তা জানত; সেজন্য দেবালয়ে আশ্ৰয় নিতে কুণ্ঠিত হতাম, তা ছাড়া আমাৰ মত দেবভক্তিহীনেৰ পক্ষে দেবতাৰ মন্দিৰে আশ্ৰয় লওয়াটা অসম্ভব বলেই মনে কৰতাম। কালীবাড়ীতে পৌছামাত্রই পূজাৰী ঠাকুৰ ভিজ-বেড়ালটিৰ মত কাছে এসে জিজ্ঞাসা কৰলেন, “আপনি কবে আফগানিস্থানে যাবেন?” ভাবখানা যেন তিনি আমাকে বেশ ভাল কৰেই চেনেন।

লোকটাৰ কথাৰ কোন জবাব দিতেও আমাৰ প্ৰবৃত্তি হ’ছিল না। তবুও ভদ্ৰতাৰ খাতিৰে বললাম, রওনা হ’লেই হ’ল আৰ কি। কাছে উপবিষ্ট একটা মোটা লোক বললে, অনেকেই বলে বটে আফগানিস্থানে যাবে, কিন্তু আসলে কেউ যায় না, যাবাৰ ক্ষমতাও রাখে না।

এদেৰ কোন কথাৰ জবাব না দিয়ে দাশগুপ্তকে নিয়ে বরাবৰ সিনেমা ঘৰেৰ দিকে চলে গেলোম। এ-সব প্রশ্ন বড় দুৰ্লক্ষণ বলে মনে হ’ল। মনে বড়ই ভয় হ’ছিল, বোধ হয় আমাৰ অগ্ৰগতিৰ পথে কোন বাধাবিঘ্ন হতে পারে। চিন্তা কৰে ঠিক কৰলাম পৰদিন সকালেই স্থানীয় আফগান-কন্সালেৰ সংগে সাক্ষাৎ কৰব এবং তাঁৰ কাছ হতেই জানতে পাৰব আমাৰ পাসপোর্টে কোন ত্ৰুটি আছে কিনা?

পৰদিন সকালেই আফগান-কন্সালেৰ বাড়ী গেলোম। পাসপোর্ট দেখেই কন্সাল অফিসেৰ একজন যুবক-কেৱানী বললেন, আপনি আফগানিস্থানেৰ দিকে রওনা হয়ে ভালই কৰেছেন। কি কৰে যে দিল্লীৰ কন্সাল-জেনাৰেল আপনাৰ পাসপোর্টে ভিসা দিয়ে দিলেন, তা মোটেই বুঝতে পাৰছি না। যা হোক, এখন আপনি এখানকাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটে গিয়ে

পাসপোর্টে “আফগানিস্তান” শব্দটি লিখিয়ে নিয়ে আসুন, তবেই সকল হাংগামা হতে রক্ষা পাবেন।

যুবকের কথামত সেক্রেটারিয়েটে গেলাম এবং একজন হিন্দু কেরানীর সংগে সাক্ষাৎ করলাম। কেরানী বেশ আরাম করে বসে ছিলেন। আমাকে দেখামাত্রই তাঁর যেন মেজাজ বদলে গেল। মেয়েলি সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, “কি চাই আপনার? আপনার জন্য আমি কি করতে পারি? বলুন, বলুন, আমার যে মরবারও ফুরসৎ নেই।” তার মুরুবিয়ানায় আমি একটু হেসে বললাম, এই আমার পাসপোর্ট, এতে আফগানিস্তান শব্দটি লিখিয়ে নিতে চাই।

আমার কথা শোনামাত্রই কেরানী চোখ দুটো কপালে তুলে বললেন, “এটা কি করে হয়? এ কখনও হতে পারে না।”

আমি বললাম, একটু বসতে চাই, আপত্তি নেই তো?

কেরানী সামনের চেয়ারটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি বসলাম এবং চশমা খুলে নিজের হাতের রেখাগুলোর দিকে নিবিষ্টমনে তাকিয়ে রইলাম, যেন আমি হস্তরেখা-বিদ্যায় খুব ওস্তাদ। কেরানীও বেশীক্ষণ আর স্থির থাকতে পারলেন না, আমাকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার হাতে কি দেখলেন? আমি মাথা ঝাঁকিয়ে গান্ধীরের ডান করে বললাম, “দেখতে পাচ্ছি তিন দিনের মধ্যে আমি আফগানিস্তান পৌঁছব, তাতে আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।” আমার কথা শুনে কেরানীও তাঁর ডানহাতটা বাড়িয়ে দিয়ে নিজের ভাগ্যের কথা আমার কাছ থেকে জানতে চাইলেন। তাঁর হাত দেখে অনুমানের উপর নির্ভর করে যা বলেছিলাম, তাতেই তিনি খুশী হয়েছিলেন।

আবার আমি তাঁর কাছে আমার কাজের কথা পাড়লাম। এবার কেরানী অনেকটা সদয়চিত্ত হয়েছেন এবং পরদিন সকালে দেখা করতে বললেন।

হিন্দু কেরানীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফেরার পথে দেখা হ’ল একটি মুসলমান কেরানীর সংগে। তিনি ডেকে নিয়ে আমাকে তাঁর রুমে বসালেন এবং বললেন, যে কাজের জন্যে আমি এতক্ষণ কথা বলছিলাম, সে কাজটি তাঁরই কাজ, অন্য কারও নয়। এই বলেই তিনি বললেন, দিন তো পাসপোর্ট, এখনই কাজটা সেরে দিচ্ছি। যুবক আমার হাত থেকে পাসপোর্ট নিয়ে তাতে আফগানিস্তান শব্দ লিখে দিলেন। তারপর বললেন, পরদিন সকালে আমি যেন প্রাইভেট সেক্রেটারির সংগে দেখা করি। বুঝলাম তিনি বেশ ভাল লোক, তাঁর দ্বারা আমার কিছু উপকারও হতে পারে।

পরদিন সকালে যুবকের কথামত প্রাইভেট সেক্রেটারির সংগে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে পর্যটকরূপেই গ্রহণ করলেন, শাসক-শাসিতের

সম্পর্ক ভুলে গিয়ে অন্তরংগভাবে আলাপ করলেন। ইংরেজ যুবক আমাকে তাঁদের দেশে যেতে উৎসাহিত করলেন এবং বিশেষভাবে বলে দিলেন, ব্রিটেনে গিয়ে যেন শিলিং হোস্টেল চেন-এর মেম্বর হই, সেই হোস্টেলগুলিতে থেকেই ব্রিটেনের জনগণের সত্যিকার চেহারা দেখতে পাব।

দারিদ্র্য জিনিসটার রূপ পৃথিবীর সর্বত্রই এক হ'লেও দারিদ্র্যের কারণ সর্বত্র এক নয়। ব্রিটেন প্রকৃতির বিরুদ্ধে সর্বদাই লড়াই করে, প্রকৃতিকে আয়ত্তে এনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুণ্ঠ করবার চেষ্টা করেছে। সে-লুণ্ঠের মোটা ভাগ পাচ্ছে যারা শক্তিমান, যারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় এবং লুণ্ঠনে যাদের প্রকৃত যোগ সবচেয়ে কম। আর যারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার জয় করে আনে, সেই সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভাগেই বখরা পড়ে সবচেয়ে কম। যান্ত্রিক সভ্যতায় যে-সব দেশ বিশেষ পুষ্টিলাভ করেছে, সে-সব দেশে দারিদ্র্য টাকাকড়ি কম বলেই নয়, বণ্টনের দোষে। আর আমাদের দেশের দারিদ্র্য যান্ত্রিক সভ্যতা বা বৈদেশিক শোষণের জন্যে ততটা নয়, যতটা আমাদের স্বভাবের দোষে। আমাদের দার্শনিকগণ দারিদ্র্যকে উচ্চ আসন দিয়েছেন। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থেকে উচ্চ চিন্তা করার শিক্ষা আমরা পেয়ে এসেছি। তাই আমাদের দেশে প্রকৃতি তাঁর সব সম্পদ উন্মুক্ত করে ধরে রাখা সত্ত্বেও আমাদের দেশের লোক ক্ষুধায় কাতর, দেনায় জর্জরিত, স্বাস্থ্যে বঞ্চিত এবং পরানুগ্রহে লাঞ্চিত। কষ্ট করে এদেশের লোক কিছু অর্জন করতে পরান্মুখ, ভিক্ষাস্বরূপ অল্পস্বল্প পেলেই সন্তুষ্ট। এতে জীবনমৃত হয়ে টিকে থাকা চলে, কিন্তু উচ্চ চিন্তা কখনই সম্ভব নয়। প্রভূত বাহ্যিক সম্পদ না হ'লে সভ্যতার উন্নতি কখনই হবে না, দরিদ্র জাতি মনুষ্যত্ব হারিয়ে ধ্বংসকে ডেকে আনবে। আমরা ভারতবাসীরাও তাই করছি।

ইংরেজ যুবকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন উঠলাম, তখন তিনি সর্বিনয়ে আমার হাতে দশটি টাকা দিয়ে বললেন, পর্যটকের পাথেয়ের জন্যে, এ তাঁর যৎসামান্য সাহায্য, আমি গ্রহণ করলেই তিনি কৃতার্থ হবেন।

এই ইংরেজ যুবকের ভদ্র ব্যবহারে সেদিন আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। প্রভুত্বের মোহে ইংরেজ তনয়গণ এদেশে অন্ধ, তাদেরই একজন এত বড় উচ্চপদের অধিকারী হয়েও আমার মত ধনমানহীন পরাধীন দেশের অধিবাসীর প্রতি যে আচরণ করলেন, তা অপ্রত্যাশিত।

যা হোক, এবার আমি ভারতের সীমান্তের দিকে পা বাড়ালাম।

সীমান্তে একটা কাস্টম হাউস আছে। কাস্টম অফিসার একজন ভারতীয়। তিনি পাঠানদের পাসপোর্টগুলি একরূপ না দেখেই সীলমোহর করলেন। তাঁর কার্যকলাপ দেখে আমি তখন ভাবছিলাম, একটা গোলাম অন্য একটা গোলামকে স্বাধীন দেশে যেতে দেখতেও রাজী নয়; এজন্যই একরূপ বাড়াবাড়িভাবে, আমার পাসপোর্ট পরীক্ষা করছে। অফিসার যখন পাসপোর্ট পরীক্ষা করে সীলমোহর করলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম,

মনে অনেক আঘাত লেগেছে নিশ্চয়ই আমাকে আটকে রাখতে পারেন নি বলে? দাসসুলভ মনোবৃত্তির এটাই বৈশিষ্ট্য। আপনি অথবা আমি যদি স্বাধীন জাতির লোক হতাম, তবে আমারই পাসপোর্টে সীলমোহর পড়ত সর্বাগ্রে। অফিসার নীরবে অন্য কাজে মন দিলেন।

সীমান্ত পার হয়ে পার্বত্য উপত্যকার উপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলাম। উত্তরের হাওয়া এসে আমার নাকে মুখে ক্রমাগত ঝাপটা মারছিল। আমার মন আরও উত্তরে যাবার জন্য উন্মুখ ছিল। কিন্তু যেতে হবে দক্ষিণ-পশ্চিমের পথ ধরে। আরও দু'মাইল যাবার পর এলাম আফগান কাস্টম্ হাউসে। সেখানে পাসপোর্ট শুধু সীলমোহর লাগিয়ে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রশস্ত পথটা ছেড়ে দিয়ে উত্তরের পথে অগ্রসর হলাম। আমার সামনে নগ্ন উন্নত তরঙ্গায়িত পর্বতমালা ক্রমে উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে আরও উত্তরে গিয়ে কালো মেঘের গায়ে মিশেছিল। সে-দৃশ্য একাকী দাঁড়িয়ে উপভোগ করতেছিলাম। সে-দৃশ্য আরও দেখবার জন্যে মন চাইছিল, দক্ষিণ দিকে যেতে মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না। উত্তরের ঢেউ-খেলানো পর্বতমালা যেন আমায় দু'হাত বাড়িয়ে ডাকছিল কিন্তু আমার গন্তব্যপথ আমায় টানছিল দক্ষিণ-পশ্চিমের পথে।

একটা পাথরের উপর বসে ভাবতেছিলাম, এই তো সেই আফগানিস্তান, আফগান জাতির বাসভূমি, যাদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের লোক কত ভ্রান্ত কাহিনী শুনে ভয়ে থর-থর করে কাঁপে। কিন্তু আমাকে তো এখনও কোন পাঠান আক্রমণ করছে না, আমি একাকী, আমার হাতে কোন অস্ত্র নেই। তারপর হঠাৎ চিন্তাধারা বদলে গেল। মনে হ'ল এটাতো বিদেশ নয়, এদেশ আমাদেরই। ঐ তো উত্তর দিক হতে হিমালয়ের শাখা হাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকছে। ঐ তো কংকরময় সমতলভূমি, দুস্মা-রক্ষকগণ লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের গোলগাল মুখ দেখলেই মনে হয় ককেশাস রক্ত তাদের শরীরে বইছে। যদিও তাদের গায়ের পোস্তিন হতে একটা বিশ্রী গন্ধ বের হয়ে আসছে, তবুও তারা স্বাধীন। স্বাধীনতার গন্ধ এক-একবার মনকে কোন্ সুদূর ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু যখনই মনে হতোছিল আমি বস্তুতপক্ষে পরাধীন দেশের লোক, তখনই কে যেন সজোরে আমাকে আছড়ে ফেলে দিতেছিল কঠিন মাটির ওপর। স্বাধীন দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজের দেশের পরাধীনতার গ্লানিকে বেশ ভাল করে হৃদয়ংগম করতেছিলাম।

সামনে চেয়ে দেখলাম একটা অন্ধকার আবরণ যেন ভারতমাতার মহিমামণ্ডিত মূর্তিকে ঢেকে রেখেছে, আর আমার হাত সেদিকে আপনি চলে যাচ্ছে অবাস্তিত অন্ধকার-আচ্ছাদনটাকে সরিয়ে ফেলতে। স্বাধীন দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল আমার কোনও অধিকার নেই স্বাধীন দেশে থাকতে। আমার গায়ের বাতাসও স্বাধীন দেশের বাতাসকে কলুষিত

করে তুলবে। তাই মনের ভেতর থেকে আত্মস্বরে একই কথা বার বার  
বেরিয়ে আসছিল— স্বাধীনতা! স্বাধীনতা!

কতক্ষণ পথ চলার পরই একটি ছোট গ্রাম পেলাম। গ্রামে গোলাবাড়ী  
নেই। গ্রামের একমাত্র দোকান অর্ধেকটা খোলা। যে অংশে বেনের দোকানের  
জিনিস বিক্রী হয় সে অংশটাই শুধু খোলা, অন্য অংশটা বন্ধ। উকি মেরে  
দেখলাম অন্য অংশটাতে গোস্ট-রুটি রয়েছে। ক্ষিদে বেশ ছিল, তাই  
দোকানদারকে বললাম গোস্ট-রুটি দেবার জন্যে। দোকানদার বললে,  
রোজার মাসে সে খাদ্য বিক্রী করবে না। আমি বললাম, তুমি না হয়  
উপোস করে স্বর্গে যাবে, আমি স্বর্গে যেতে চাইনে, বেঁচে থাকতে চাই।  
তারপর আমি মুসলমান ধর্মের লোকও নই, আমার কাছে খাদ্য বিক্রী  
করতে কি আপত্তি থাকতে পারে? উপরন্তু আমি ক্ষুধায় কাতর। দোকানদার  
বললে, যদি নিজের হাতে খাবার নিয়ে খাই তবে বিক্রী করতে তার কোন  
আপত্তি নেই। আমি তাতে রাজী হলাম।

একটা ডালাতে কতকগুলো পাঠান-রুটি এক টুকরা ময়লা কাপড়  
দিয়ে ঢাকা ছিল। রুটিগুলি চাপাতি হতে চারগুণ বড় এবং চের পাতলা।  
রুটি হতে বেশ মিষ্টি গন্ধ বের হয়ে আসছিল। দু'খানি রুটি বের করে নিয়ে  
ডালাটিকে পূর্বের মত ঢেকে রেখে নিকটস্থ একটা হাঁড়িতে হাত দেওয়ামাত্র  
দোকানী চীৎকার করে উঠল। বললে, এটাতে যে-মাংস আছে তা তুমি  
খেতে পার না, দাঁড়াও আমি গরম জল নিয়ে আসছি। বুঝলাম তাতে  
গোমাংস ছিল। গরম জল এনে দেবার পর অন্য হাঁড়ি হতে দু' টুকরা  
মুরগীর মাংস বের করে নিলাম। এ-সব হোটеле মুরগীটাকে মাত্র চার টুকরা  
করেই পাক করা হয়। দু' টুকরা মুরগীর মাংস এবং দু'খানা পাঠান-রুটি  
অবলীলাক্রমে উদরস্থ করলাম।

ভোজনের তৃপ্তি মুখেই ফুটে ওঠে। আমার মুখাবয়বে সেই তৃপ্তির  
ভাব ফুটে ওঠায় পাঠানও খুশী হয়েছিল। ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর  
প্রান্ত পর্যন্ত বেড়িয়ে অনুভব করেছি, ভোজন করিয়ে তৃপ্ত হতে অনেকেই  
চায়। বর্তমানে অভাবের তাড়নায় এই ভাবটি লোপ পেতে বসেছে। পাঠান  
যদিও পয়সা নিয়েই আমার কাছে খাদ্য বিক্রী করেছিল, তবুও তার মুখে  
আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠতে দেখে স্বভাবতঃই ভারতীয় কৃষ্টির কথা মনে  
পড়ল। বিদায় নেবার বেলা মাথায় টুপি রেখেই তাকে আমি যুক্তকরে  
নমস্কার করলাম। পাঠানও আমাকে নমস্কার বলে জোড়হাত করতে  
ভুলেনি। কিন্তু আমাদের আচারব্যবহারের কথা মনে হওয়ামাত্র মাথা নত  
হয়ে এল। অনেক দুঃখ হ'ল কিন্তু প্রতিবাদের উপায় ছিল না; ভাবছিলাম  
কবে স্বাধীন হব এবং পাঠানদের মত উদারচিত্তে উপবাসের দিনেও একজন  
পাঠানকে নিজের ঘরে বসিয়ে খাওয়াতে পারব।

দোকান থেকে বেরিয়ে পথে দাঁড়ালাম; তারপর মাইল পাঁচেক যাবার  
পর দূর থেকে একটি টিলার উপর একটি বাংলা ধরণের বাড়ী দেখতে